# পরচর্চা পরিচয়

প্রদীপ বসু



একটা সময় ছিল যখন পরনিন্দা পরচর্চা কেচ্ছা ছিল বাঙালি সমাজ জীবনের এক বিশিষ্ট অঙ্গ। সেই সমাজের নীতিবোধ এই সব কুৎসার প্রচারে কোনও বাদ সাধত না, বরং পরনিন্দা পরচর্চা চিল মানুষের আনন্দ ও উত্তেজনার খোরাক। অনেকে বলেন, কলকাতা শহর ছোট ছিল, গ্রামীণ প্রভাব মুক্ত ছিল না, নিষ্কর্মাও ছিলেন অনেক, নিন্দা কলঙ্কের খবর দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটে যেত, পৌঁছে দেবার লোকেরও অভাব ছিল না এবং শেষ অবধিটাকা দিয়ে ছাপিয়ে তা প্রচারও করা হত। হুতোম লিখেছেন 'আমাদের পূর্বপুষেরা পরস্পর লড়াই করেছেন, আজকাল আমরা সর্বদাই পরস্পরের সাক্ষাতে নিন্দাবাদ করে থাকি, শেষে এক পক্ষের খেঁউড়ে জিতে ধরাই আছে'। বই ছাপিয়ে কেচ্ছা প্রকাশ করা একরকম সামাজিক অনুমোদনও লাভ করেছিল। তাই এমনকি ব্রাহ্মরাও কুচবিহার বিবাহের সময় বই ছাপিয়ে এর বিরোধিতা করেছিলেন। এইসব কেচ্ছার এক বড় অংশ জুড়ে থাকে যৌন কেলেঙ্কারি,পারিবারিক ব্যভিচার সংক্রান্ত বিবরণ এবং এ বিষয়ে বেশ পপুলার পত্রিকাও ছিল। সম্বাদ রসরাজ যেমন চলেছিল প্রায় আঠারো বছর, এছাড়া ছিল ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত পাষন্ডপীড়ন। যেমন সম্বাদ রসরাজ প্রকাশিত হত প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার। পত্রিকায় নাম ধাম সহ বিভিন্ন যৌন কেচ্ছার কথা প্রকাশিত হত বীরনৃসিংহ মল্লিকের শ্বশুর লোকনাথ মল্লিক কী ভাবে তার পুত্রবধূকে ধর্ষণ করেছেন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী যে 'বালক ধর্ষণ করেন' সেই সংবাদ, ঈশ্বর গুপ্তের গুপ্ত চরিত্র সব কিছুই কোনওরকম রাখা ঢাক ছাড়াই প্রকাশিত হতো। এইসব রসালো কেচ্ছা কলকাতার মানুষও খুব মন দিয়ে পড়তেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন '(যদিও) অশ্লীলতা ইহার পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছিল, (কিন্তু) ইহার গ্রাহক সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেযুগের কোন ভাল সংবাদপত্রেও এত গ্রাহক ছিল না।'আর হবে নাই বা কেন ? শহরের নামী পরিবারেরা এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যেমন ঠাকুর পরিবার, সিংহ পরিবার, মালঙ্গার দত্ত পরিবার, রসময় দত্ত, খেলাত চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি। এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য এঁরা যে লজ্জিত ছিলেন এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

নিজের প্রতিচ্ছবি

এইসব পরনিন্দা পরচর্চা করার একটা যুক্তিও ছিল। সেটা হল সমাজের দোষ ত্রুটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। এই সমাজে প্রাইভেট এবং পারলিক বিভাজন স্বীকৃত নয়, সকলের অন্য সকলের উপর নজরদারির অধিকারআছে, ব্যক্তিজীবনের গোপন কথাও জনসমক্ষে প্রচার করতে কোনও বাধা নেই। মূদ্রণ শিল্পের আমদানি প্রচারকে আরও ব্যাপক করেছে মাত্র। হুতোম তাঁর নকশার ভূমিকায় লিখেছেন 'পাঠক ! কতগুলি আনাড়িতে রটান, হুতোমের নকশা অতি কদর্য্য বই' কেবল পরনিন্দা পরচর্চা খেঁউড় ও পচালে পোরা ও শুদ্ধ গায়ের জ্বালা নিবারনার্থ কতিপয় ভদ্র লোককে গাল দেওয়া হয়েছে। এটি বাস্তবিক ঐ মহাপুষদের ভ্রম; .... তবে বলতে পারেন ক্যানই বা কলকেতার কতিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্তবর্ত্তী হলেন, কি দোষে বাগাম্বর বাবুরে প্যালানাথকে পদ্মলোচনকে মজলিসে আনা হলো, ক্যানই বা ছুঁচো শীল, প্যাচা মল্লিকের নাম কল্লে, কোন দোষে অঞ্জনারঞ্জন বাহাদুর ও বর্দ্ধমানের হুজুর আলী আর পাঁচটা রাজা রাজড়া থাকতে আসোরে এলেন?তার উত্তর এই যে, হুতোমের নক্শা বঙ্গ সাহিত্যের নূতন গহনা, ও সমাজের পক্ষে নুতন হেঁয়ালি ; যদি ভাল করে চকে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হয়, তা হলে সাধারণে এর মর্ম্ম বহন কত্তে পাত্তেন না ও হুতোমের উদ্দেশ্য বিফল হতো'। এই পরচর্চা পরনিন্দাকে অনেকে তাইআয়নার সঙ্গে তুলনা করেছেন, যেন সমাজের মানুষের নিজেরই প্রতিচ্ছবি এইসব বিবরণে তুলে ধরা হচ্ছে। হুতোমও বলেছেন নকশাখানিকে আমি একদিন আরসি বলে পেস কল্লেও কত্তে পাত্তেম, কারণ পূর্ব্বে জান ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য্য দেখে কোন বুদ্ধিমানই আর সিখানি ভেঙে ফেলেন না বরং যাতে ক্রমে ভাল দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন....'। অর্থাৎ এই পরনিন্দা পরচর্চা হল সমাজদর্পণ।

কী এই সমাজ ? এই সমাজে দল আছে, দলাদলি আছে, দলপতি আছেন, তাদের মোসাহেবরা আছে, যারা 'সর্বদাই আষাঢ়ে গল্প, পরের নিন্দা ও নূতন নূতন সংবাদ বলিয়া বাবুর অত্যন্ত প্রিয় হন' (আপনার মুখ আপনি দেখ, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৮৬৩), এখানে এখনও কারও নিভৃত জীবনযাপনের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়নি। সমাজ যাঁরা শাসন করেন তাঁদের চরিত্রের সঙ্গে সমাজের চরিত্রের যোগ ঘনিষ্ঠ—এই হল সমাজ সম্পর্কে মানুষের ধারণা। অন্যদিকে যেহেতু এক ধরনের পরিবর্তনও আসছে, তাই নতুন নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব হচ্ছে, তাদের জাতিগত কৌলিন্য নেই অথবা পয়সা দিয়ে বা মিথ্যা প্রচারের সেই কৌলিন্য তারা আদায় করেছে সুতরাং সমাজে এক মেকি বিন্যাস ঘটেছে, কে উঁচু কে নিচু বোঝার উপায় নেই। তাই জাতপাতের কেচ্ছা, বংশদোষের বিবরণ পরনিন্দা পরচর্চার এক প্রধান বিষয় ছিল। অমুক বংশের এখন এক নাম, কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পাচক, ঠাকুর বংশ সমাজের মাথাহলে কী হবে আসলে পিরিলা ব্রাহ্মণ, সদ্‌ব্রাহ্মণরা তাদের সঙ্গে আহার বিবাহ করেন না, এই সব কথারও প্রভূত চলছিল। এছাড়া সমাজের মাথা কিন্তু আসলে বকধার্মিক, ভন্ড -- এমন মানুষেরও মুখোশ খুলে দিতে হবে। হুতোম যেমন লিখেছেন 'বাগাম্বর মিত্র প্রভৃতি সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র ; বলতে গেলে এঁরা একরকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কত্তে গেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে গন্ধকরে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেই রূপ কেবল স্বার্থ সাধনার্থ স্বদেশের ভাল চেষ্টা করেন। "ক্যামন করে আপনি বড়লোক হব", "ক্যামন করে সকলে পায়ের নীচেথাকবে" এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা --- পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে আপনার গোঁপে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী, এঁদের কাছে দাতব্য দূরপরিহার --- চার আনার বেসী দান নাই।' সকলেই সকলের সম্বন্ধে নানাবিধ কেচ্ছা কেলেঙ্কারী বংশদোষ লিখে প্রচার করতে পারতেন। তার উত্তর প্রত্যুত্তরও কম হত না, এ ছিল সত্যিকারের বাক্‌স্বাধীনতার যুগ। কেচ্ছার প্রচার সমাজে স্বীকৃত ছিল, চির প্রশণও তখন ওঠেনি। একে অন্যের খবর জোগাড় করে তা প্রচার করবে

এ সমাজ প্রক্রিয়ারই অংশ ছিল। শুধু বড়লোকেরাই তাঁদের চেলা চামুন্ডা নিয়ে এরকম আনন্দ করতেন তা নয়, গরীবদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহ কম ছিল না। নানা কবিগান, সঙের গান, ছড়ায় তার সাক্ষ্য রয়ে গেছে।

সমাজতত্ত্বে পরনিন্দা পরচর্চার নানাবিধ ব্যাখ্যা আছে। সমাজতত্ত্বে বলে, সব সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নানাবিধ উপায় থাকে। পরচর্চা পরনিন্দা হল সেরকম একটি উপায়। সোজা কথায় বলতে গেলে, সমাজে নিন্দা হবে বলে আমরা যেমন অনেক কাজ করতে ভয় পাই — এটাই হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। সমাজ যে সমষ্টিকে নিয়ে গঠিত সেই সমষ্টির এক সামাজিক আদর্শ আছে। পরনিন্দা পরচর্চা, যারা এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত তাদের সমষ্টির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। এ হল পরনিন্দা পরচর্চার ইতিবাচক দিক। নেতিবাচক দিকের কথা আমরা সবাই জানি। কেচ্ছা, পরচর্চা সমাজে বিরোধের সূত্রপাত করে, ফলে এটা একটা সামাজিক সমস্যাও বটে। সুতরাং এই অর্থে পরচর্চা পরনিন্দা এক সমাজবিরোধী কার্যকলাপ। পরচর্চা পরনিন্দা সমাজের দলগুলির এক ধরনের সীমানাও নির্দেশ করে দেয়। প্রতিটি দল বা গোষ্ঠী নিজেকে সামাজিক নৈতিকতার ধারক ও বাহক মনে করে অন্যের নিন্দা করতে থাকে, ফলে পরনিন্দা পরচর্চার বাহুল্য একভাবে সামগ্রিক সমাজের নৈতিক বিশৃঙ্খলার সংকেতও দেয়। পরচর্চা পরনিন্দা দলগুলির ঐক্য, নৈতিকতা এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। কারণ সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, পরচর্চা পরনিন্দার মূল কথা হল একটানা সমিষ্টগত মূল্যায়ন (যদিও পরোক্ষ এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে) এবং সামাজিক প্রত্যাশার মাপকাঠিতে বিভিন্ন কাজকর্মের অনুমোদন বা সমালোচনা। পরচর্চা পরনিন্দার মাধ্যমে দলগুলি তাদের প্রতিযোগী দল ও তার সদস্যদের উচ্চাশা নিয়ন্ত্রণ করে ; মতপার্থক্য, উচ্চাভিলাষ নিয়ে ঝগড়া পর্দার পিছনে হতে থাকে যাতে বাইরে এক বন্ধুত্বের পরিবেশ বজায় থাকে। পরচর্চা পরনিন্দা তাই হল, যে কোনও দলের সম্পত্তি, সম্পদও বলা যায়। দলের সদস্য হলেই তাকে পরচর্চা পরনিন্দা করতে হবে। সুতরাং পরচর্চা পরনিন্দা সম্পর্কে সাধারণত যে বিশেষণগুলি প্রয়োগ হয়, যেমন অলস, বৃথা, বাজে উদ্দেশ্যহীন ইত্যাদি, তা কিন্তু মোটেই সত্যি নয়।

### প্রা যখন চির

যদিও দলাদলির পরবর্তী সময় বাঙালি সমাজে অনেকে পরচর্চা পরনিন্দার বিদ্ধে খড়গস্ত হয়েছিলেন। মূল অভিযোগ ছিল চি নিয়ে। এগুলি যে ভাবে প্রকাশিত হত, অভিযোগ ছিল তা অত্যন্ত নিম্নচির, সাহিত্যগুনের লেশমাত্রনেই এবং মজার কথা হল এগুলি প্রকাশ প্রচারের জন্য কেউ লজ্জিত হতো না। এই চির মান সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন 'রসরাজ', 'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল' প্রভৃতি অশ্লীলভাষী কাগজগুলি ছাড়িয়া দিলেও 'প্রভাকর' ও 'ভাস্করের' ন্যায় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত যাহাভদ্রলোক ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না' (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ ১৯০৩)। তখন অনেকের বিশ্বাস ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি হলেই পরচর্চা পরনিন্দার বিদ্ধে অন্যান্য যুক্তিও ছিল, যেমন সময়েরঅপচয়, কর্মের ক্ষতি, অনৈতিক, কুদৃষ্টান্তের প্রচার ইত্যাদি। কিন্তু শেষ অবধি সংস্কারের মূল লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ান বাঙালি নারীরা। বাংলা পত্রপত্রিকায় বাঙালি নারীদের নিয়মিত মনে করিয়ে দেওয়া হয়, পরনিন্দা পরচর্চা করে সময় নষ্ট করবে না, বরং গৃহকাজ করো, সেলাই করো, রান্নাবান্না করো, ঘরসাজাও, ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা দাও,মোট মুটি সময়টা গৃহ ও পরিবারের উন্নতির জন্য ব্যয় করো। হঠাৎ নারীরা কেন ? এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হল, ঔপনিবেশিক শাসনে যখন বাইরের জগতে বাঙালি ক্ষমতাশালী হন তখন গৃহ ও পরিবারকে নিজের কর্তৃত্বের এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ হিসেবে সৃষ্টি করা। বাইরের জগতের বিপরীত মেতে অবস্থিত এই পরিবার হবে সর্বাঙ্গ সুন্দর, সুসমঞ্জস, নির্বিরোধ এক ক্ষেত্র। পরিবারকে এরকম একটি আদর্শে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব অবশ্যই নারীর। সেইজন্য নারীকে তার কুঅভ্যাসগুলি ছাড়তে হবে।

এ বিষয়ে অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয় আমি একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিত স্ত্রী চরিত্র (১৮৯১) বইটি থেকে। বলাবাহুল্য, লেখক বইটি লিখেছিলেন নারীদের উন্নতি বিষয়ক উপদেশ দিতে এবং তাদের চরিত্রের উন্নতি করতে। প্রথম সংস্করণের পর বুঝতে পারেন একটি গুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়ে গেছে। সেটা হল 'পরনিন্দা'। এই বিষয়টি তাই দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করেন। এবার সেই উপদেশ থেকে একটু লম্বা উদ্ধৃতি 'পরনিন্দা দোষ নাই, এমন চরিত্রের লোক প্রায় কোন দেশেই পাওয়া যায় না ; কিন্তু ভদ্রমহিলার পক্ষে ইহা বিশেষ গর্হিত। প্রয়োজন হইলে সত্য প্রকাশ করিবে, কিন্তু অপরের চরিত্রদোষ লইয়া আন্দোলন ও আমোদ করিবে না। পরচর্চা করা স্ত্রী জাতির একটি সাধারণ অভ্যাস। বোধহয়, ইহার কারণ এই যে, উচ্চ বিষয়ে তাঁহারা মনোযোগ করেন না, ভাল বিষয়ে তত্ত্ব রাখেন না, লোকের সঙ্গে দেখাশুনা প্রায় ঘটে না ; সুতরাং দশজনে একত্রে হইলে প্রায় অনুপস্থিত ব্যাক্তিদিগেরচরিত্র বিষয়ে আলোচনা উপস্থিত হয়। প্রথম বয়স হইতে এই দোষ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইবে। ... জ্ঞানে, সদ্ভাবে, সচ্চরিত্রে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হও, এবং যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগের সহবাসে শ্রেষ্ঠ বিষয়ে আলাপ কর। কোন্ বাটিরকর্ত্তা কত আহার করেন, কোন্ পরিবারের বধু মুখরা, কাহার সৌন্দর্য্য কাহার সৌন্দর্যাপেক্ষা অধিক, কার শাশুড়ী জ্বালা দেয়, কারর স্বামী একটা পাশ করিতে পারে নাই, সে সমস্ত বিষয়ে তোমার মতামত প্রকাশ করা অনাবশ্যক। নিন্দার এমন অভাবনীয় শক্তি আছে যে, তাহা প্রাচীর ভেদ করিয়া নিন্দা করিলে শত জনের নিন্দা করিবার অভ্যাস হয়, এবং এতুর্দ্দিকে এত গরল সঞ্চারিত হয় যে, তদ্বারা জনসমাজ অতি কষ্টের স্থান হইয়া পড়ে।' সুতরাং এই সব কুৎসিত আমোদ ছেড়ে স্ত্রীলোকেদের নির্দোষ আমোদের মাধ্যমে — যেমন কবিতাপাঠ, সঙ্গীতবিদ্যা, চিত্র বিদ্যা —অবসর যাপনের পরামর্শ দেন।

কিন্তু বললে কী হবে, নারী পুষ কেউই পরনিন্দা পরচর্চা করা ছেড়ে দেয়নি। আগেও যেমন ছিল এখনও তেমন আছে। ভাষার প্রয়োগের পরিবর্তন হয়তো কিছুটা হয়েছে, অন্ততঃ পাবলিক পরিসরে, কিন্তু দলভিত্তিক পরনিন্দা পরচর্চা করার চরিত্র বিশেষ একটা বদলায়নি। দল থেকে উপদল ও দলাদলির সৃষ্টি আমাদের রাজনীতিতে এখনও বর্তমান। দলাদলি পরনিন্দার মধ্যেই উপদলীয় কোন্দলের বীজ নিহিত থাকতো, এখনও যেমন রাজনীতিতে থাকে।পরনিন্দা রাজনীতিতে অনেক সময় গালাগালিতে রূপান্তরিত হয়, এ নিয়ে নানা বিতর্কও আছে। ব্যক্তি জীবনের দোষত্রুটির কথা পাবলিক পরিসরে কেন আসবে? উত্তরে অবশ্য অনেকে বলেছেন রাজনীতিতে ব্যক্তির জীবনকে বাদ দিয়ে তার পাবলিক ইমেজ তৈরি হয় না। সুতরাং পরনিন্দার ফলে একজনের ব্যক্তিগত কুকর্ম পাবলিক পরিসরে এলে শেষ অবধি জনগণেরই লাভ, গণতন্ত্রের পক্ষেও ভাল। কারণ যা রটে তা কিছুটা তো বটে শেষ অবধি ম্যাকিয়াভেল্লীর সেই উক্তি আমাদের মনে রাখতে হবে যেখানে তিনি বলেছেন 'তুমি যে-রকম প্রতিভাত হও, সকলে তোমাকে সেরকমই জানে, খুব কম লোকই জানে তুমি বাস্তবে কী এবং তারা সাধারণ মতের বিদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করে না।... জনসাধারণ সবসময়ই বস্তুর ভাসা ভাসা বাহ্যরূপের দ্বারাই প্রভাবিত হয় (অর্ণব চট্টোপাধ্যায়রে সৌজন্যে প্রাপ্ত। তাছাড়া পার্সেনাল যে পলিটিকাল এটাই বা কে অস্বীকার করবে?

### আড্ডার কথা

যে প্রতিষ্ঠানটি বাঙালির পরনিন্দা পরচর্চার ঐতিহ্যকে সমানে ধরে রেখেছে তা হল বাঙালির আড্ডা। আড্ডা সম্বন্ধেজনসমক্ষে খুব ভাল ভাল কথা শোনা যায়, যেমন

কত নতুন বিষয়ে জেনেছি, কত বইয়ের সন্ধান পেয়েছি, কীরকমসব উইটি কথাবার্তা ইত্যাদি। কিন্তু আসল কথা হল পরচর্চা পরনিন্দা ছাড়া আড্ডা হয় না, সত্যি কথা বলতে কি আড্ডা জমেও না। ইদানিং স্টেজে একরকম আড্ডা হতে দেখা যায় —সাহিত্যিকদের আড্ডা, কবিদের আড্ডা। প্রায় বিজ্ঞাপিত হতে দেখা যায় তিনদিনব্যাপী সাহিত্য মেলায় থাকবে গল্পপাঠ, কবিতাপাঠ আর থাকবে আড্ডা। কাগজেএই সব আড্ডার ছবিও দেখি, স্টেজে আড্ডারত কবি সাহিত্যিকদের হাসি হাসি মুখ, স্টেজের সামনে দর্শক, আড্ডারতসকলের হাতে একটি করে মাইক— শ্রোতাদের সেই আড্ডা শোনাতে হবে যে। বস্তুত এ হল এক মেকি, লোকঠকানো আড্ডা কারণ এই আড্ডয় পরনিন্দা পরচর্চা করা চলে না। তাহলে দর্শক কী বলবে? এতে অবশ্য বোঝা যায় সর্বসমক্ষে পরচর্চা করাটা সুচির পরিচয় নয়, বোধ -এর এই পরিবর্তনটা এসেছে। পরনিন্দা পরচর্চার পরিসরও তাই সরে এসেছে আড্ডায়। আড্ডায় পরচর্চা খোলেও ভাল।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর আড্ডা সম্পর্কিত বিখ্যাত লেখায় বলেছেন, পরচর্চার আসর জমালে আড্ডার আর আত্মা থাকে না। লিখেছেন 'শুনতে মনে হয় যে ইচ্ছা করলেই আড্ডা দেয়া যায়। কিন্তু তার আত্মা বড়ো কোমল, বড়ো খামখেয়ালি তার মেজাজ, অতি সূক্ষ্ম কারণে উপকরণের অবয়ব ত্যাগ ক'রে সে এমন অলক্ষ্যে উবে যায় যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু বোঝাই যায় না। আড্ডা দিতে গিয়ে প্রায়ই আমরা পরাবিদ্যার — মানে পড়াবিদ্যার আসর জমাই, আর নয়তো পরচর্চার চন্ডীমন্ডপ গ'ড়ে তুলি' (কলকাতার আড্ডা, সমরেন্দ্র দাস (সম্পা), ১৯৯০। কিন্তু কেন শেষ অবধি পরচর্চাই আড্ডাকে ধরে রাখে তার একটা পরোক্ষ উত্তরও বুদ্ধদেব বসু দিয়ে দিয়েছেন 'হয়তো স্থির করলুম যে সপ্তাহে একদিন কি মাসে দু - দিন সাহিত্যসভা ডাকবো, তাতে জ্ঞানীগুণীরা আসবেন এবং নানারকম সদালাপ হবে। পরিকল্পনাটি মনোরম তাতে সন্দেহ নেই ; প্রথম কয়েকটি অধিবেশন এমন জমলো যে নিজেরাই অবাক হয়ে গেলাম, কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল যে সেটি আড্ডার স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে কর্তব্যপালনের বন্ধ্যা জমিতে পতিত হয়েছে।' কাজের বাইরে যেখানে মানুষ জমায়েত হচ্ছে সেখানে কেউবা কর্তব্যপালনের গন্ডিতে আবদ্ধ হতে চায় ? পরচর্চা আসর ছেড়ে উঠতে চায় না। ইদানীংকালে অনেকে আড্ডাকে বাঙালি আধুনিকাতার ফলশ্রুতি এক পাবলিক পরিসর হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু যদি স্বীকার করা হয় পরচর্চা পরনিন্দা আড্ডার প্রাণপ্রতিম তাহলে কিন্তু আড্ডাকে ঠিকপাবলিক পরিসর হিসেবে মানা যায় না। পরচর্চা পরনিন্দার মাধ্যমে আড্ডা এক সাংকেতিক ভাষা তৈরি করে, যে ভাষা আড্ডার সদস্যরাই বোঝেন এবং উপভোগ করেন। কোনও বাইরের লোক এই কথাবার্তার মর্ম বুঝতে পারবেন না। আড্ডা বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন নামকরণ করে, আড্ডার সদস্যরা এই সব মানুষের কীর্তিকলাপের ধারাবাহিক খবর রাখেন, ফলে দুটি একটি বাক্যে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেওয়া যায়। এইভাবে আড্ডা তার একটা প্রাইভেট ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করে নেয়। এই প্রাইভেট ল্যাঙ্গুয়েজ আড্ডাকে যেমন এক আইডেনটিটি প্রদান করে, তেমনই তাকে পাব্লিক হতে দেয় না। শুধুমাত্র আড্ডাই নয়, সমাজের সব ক্ষেত্রেই পরনিন্দা পরচর্চা উপস্থিত, তা সে স্কুল, কলেজ, অফিস বা পরিবার হোক। পরিবারের মধ্যে পরনিন্দা পরচর্চা তো বস্তুত একটা আলাদা আলোচনার বিষয়। তবে শুধু দল বা গোষ্ঠী পরচর্চা পরনিন্দার উৎস, ব্যক্তি নয়, এরকম ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। অনেকে বরং বলবেন, পরচর্চার সাহায্যে ব্যক্তি সংস্কৃতি নিয়মগুলিকে ম্যানিপুলেট করে এবং নিজের স্বার্থকেই প্রক্ষিপ্ত করে ও এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই দল পরচর্চা হল মূলত ঃ এক স্বার্থের খেলা। তাই এক্ষেত্রে দলের ঐক্য হল ব্যক্তির নিজের স্বার্থকে ম্যানেজ করার এক কৌশল মাত্র। এক কথায়, পরচর্চা হল নৈতিক বিন্যাসকে বেঁকিয়ে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা। এই আচরণ বস্তুত এক ধরনের কার্যসিদ্ধির আচরণ যেখানে আনুষ্ঠানিক স্তরে এমন এক ধরনের খবরের আদানপ্রদান হচ্ছে যা হয়তো আংশিক, অসম্পূর্ণ, খবরকে ম্যানিপুলেট করা হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তিদের দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে।এই রচনার প্রথম দিকে যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম এরং উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে মিলিয়ে এক তৃতীয় ব্যাখ্যাও প্রস্তুত করা যায় যেখানে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিভাজনকে ভেঙে ফেলা সম্ভব। আমরা বলতে পারি, দৈনন্দিন কথাবার্তায় আমরা সামাজিক সম্পর্কগুলিকে ও সাংস্কৃতিক বাস্তবকে রিপ্রেজেন্ট করি; পরচর্চায় আমরা ব্যক্তিকে দেখি সক্রিয়ভাবে তারজীবন ও জগৎকে নিয়ে জল্পনাকল্পনা করতে। এখানে পরচর্চা ব্যক্তিকে তার সামাজিক পরিবেশের এক মানচিত্র যেমন দেয় সেরকমই এই গন্ডির মধ্যে বসবাসকারীদের সাম্প্রতিক খবর, ঘটনাবলি ও তাদের মেজাজ, স্বভাব, প্রবণতা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে। যে পরচর্চা করে সে এই রসদের সাহায্যে নিজের কর্মপদ্ধতি স্থির করতে পারে। পরচর্চা ব্যক্তিকে সামাজিক - সাংস্কৃতিক নিয়ম ও নিজের আচরণের মধ্যে আপস-নীমাংসা করতেও সাহায্য করে। পরচর্চাই এক পরা- সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ বা প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিরা যে সব নিয়ম রীতির মধ্যে বসবাসকরে তা নিয়ে যেমন আলোচনা করে , আবার সে সব বাজিয়েও দেখে নিতে চায়। তাছাড়া, নিয়ম যেহেতু সব সময়ই আপেক্ষিক, অনির্দিষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক, তাই তার ব্যাখ্যাও চূড়ান্ত বা সর্বসম্মতিপুষ্ট হয় না। সেই জন্য পরচর্চা অবিরতদৈনন্দিন জগৎকে মূল্যায়ন করে, বিনির্মাণ করে ও পুনর্গঠন করে।

শেষ করি পরচর্চার অন্য আর এক দিকের কথা বলে। গল্প, উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই এমন কিছু চরিত্র যাদের বলা যায় 'পরচর্চার কণ্ঠস্বর'। ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির এখনও পরিচয় হয়নি। একটু পরে সে যেখানে যাচ্ছে পরিচয় হবে মেয়েটির সঙ্গে। ছেলেটির সঙ্গে রয়েছে তার বান্ধবী— 'পরচর্চার কণ্ঠস্বর'—চলেছে সেই মেয়েটির সম্বন্ধে কথাবলতে বলতে, নানারকম কথা। মেয়েটি পরচর্চা করছে হাল্কা চালে, ঠান্ডা গলায়। একটু পরেই ছেলেটি যখন মেয়েটিকে দেখবে প্রেমে পড়া ছাড়া তার আর কোনও উপায় থাকবে না। বান্ধবী বলতে বলতে চলেছে মেয়েটি বাগ্‌দত্তা,ছেলেটির তার প্রেমে পড়া উচিত নয় ইত্যাদি। এইভাবেই পরচর্চা গল্পের চুম্বক রচনা করে গল্পটিকে যেন ঘোষণা করে দিচ্ছে। পরচর্চা এখানে যেন সত্যেরই একরকম উচ্চারণ। যেহেতু পরচর্চার কণ্ঠস্বর ঠান্ডা, হালকা, তা যেন বস্তুনিষ্ঠ– একভাবে জ্ঞানেরই যে প্রতিরূপ বা জুড়ি। সত্যিতো পরচর্চার কণ্ঠস্বর সবসময়ই তাচ্ছিল্যপূর্ণ, অবজ্ঞাসূচক, হালকা, ঠান্ডা, বস্তুনিষ্ঠ — এ যেন সব সময়েই আমাদের জ্ঞান এবং বিজ্ঞানকেই মনে করিয়ে দিতে থাকে।



সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com